Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 107-114
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ : পরিবেশ, উন্নয়ন ও রাজনীতি

পার্থ সাউ
গবেষক, (পি.এইচ.ডি), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়,মেদিনীপুর

Abstract

Agricultural land is a vital ecological/economical resource which preserves the sustainable development of the farmers, as well as the protection of the livelihood of the families involved in agriculture. In the name of development, when the peoples involved in agriculture are separated from agricultural land their Occupation, life and livelihood along with environment becomes absolutely insecure. The draconian 1894 colonial land acquisition law which was implemented in Singur for the construction of small car industry by Tata Motors was a severe threat to the livelihoods farmers, field lobour (khetamajur) sharecroppers (bargadars). The environment/ecology was threatened and there was a widespread fear and panic of eviction which led to a violent organized movement. The movement has raised some basic questions in the field of policy formulation and in the concept of environment friendly development by the state. The densely populated areas between the Ganges and Damodar River was chosen to fulfil the aims of political determination without considering the basic aspects of Agro Ecology and Agrarian Socio-economic Formation. Presently in this time of globalization and liberalization we cannot deny the importance of industries, but in adopting the policy we must pay attention on the type of industries and the appropriate place to be chosen for the industries along with appropriate attention should be given for those peoples who are uprooted from their livelyhood and socio-economic environment must be provided with the facilities of absolute rehabilitation and resettlement. In a developing country like India dependent on agro-based economy the policies of agricultural land accusations for development along with establishment of industries with analysis from an ecological/environmental view point.

Keywords: Environmental resources, livelihoods, sustainable development, land acquisition, ecological balance.

ভূমিকা: উত্তর উপনিবেশিক পর্বে ইতিহাস গত ভাবে; ভারত সহ সমস্ত কৃষি প্রধান উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়ন তথা উন্নয়ন বলতে মূলত যে সমস্যাটি সামনে আসে তা হল শিল্প স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং অধিগ্রহণের কারণে জমি থেকে কৃষকের উচ্ছেদ। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ), শিল্পাঞ্চল,নগরায়ণ এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মের নামে রাষ্ট্র নির্বিচারে কৃষকের জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রায়শই রাষ্ট্রের আইনি ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা

সরাসরি প্রয়োগ করেছে।স্বাধীনোত্তর ভারতে বেশিরভাগ সরকার "Eminent Domain"[1] ইত্যাদি তত্ত্বের আড়ালে এককালীন ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণের নীতিকে বেছে নিয়েছে। যা মানবিক অধিকারের ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অগণতান্ত্রিক। শিল্পায়নের জন্য অধিগৃহীত জমির মালিকদের অন্যত্র বসতি দেওয়া,নতুন জীবিকার পুনর্বাসিত করা, ক্ষেত মজুর বা বর্গাদারদের জীবন-জীবিকা-আশ্রয় এর বিকল্প সংস্থান করা— এই ধারণাগুলি তেমন গুরুত্ব পায়নি। উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য যেমন জমির প্রয়োজন,তেমনি কৃষিকাজ ও খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও হচ্ছে এই জমি বা মাটি। খাদ্য ও পুষ্টি এবং জীবিকা তথা কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তা তথা পরিবেশের জন্য কৃষিক্ষেত্র তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। উপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে বিশ্বায়িত উদার অর্থনীতিতে রূপান্তর সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। কিন্তু ভারতে মূলত জমি অধিগ্রহণ যে আইনের বলে করা হত তা হল ১৮৯৪ সালের ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইন। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিল্পস্থাপন, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য কাজে কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিকে নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের মধ্য নীতি ও প্রন্থা বিষয়ে নানান বিষয় সামনে এসেছে বা আসছে। একদিকে যেমন কিছু জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মতামত উঠে আসছে, আবার অপরদিকে উন্নয়নের তত্ত্ব কে সামনে রেখে জমি অধিগ্রহণ যে জরুরি এ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সিঙ্গুরে টাটা ছোট গাড়ি নির্মাণের জন্য কৃষি জমি অধিগ্রহণের ফলে,এই অঞ্চলে পরিবেশ ও সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তনশীল সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল,এই পরিবর্তনশীল সম্পর্ক পরিবেশ জগতে (Ecological Regime) পাশাপাশি ওই অঞ্চলের গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতি ও সামাজিক-পরিবেশের ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল তা বলা যায় নিঃসন্দেহেই। সাধারণ চাষী, নথিভুক্ত ও অনথিভূক্ত ভাগচাষী, ক্ষেতমজুররা কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল, মূলত তাঁদের জীবন, জীবিকা ও পরিবেশ জগতকে হারানোর আশঙ্কা থেকে (জোয়ারদার, ২০০৯)। সিঙ্গুর অঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক শক্তি দীর্ঘ সময় ধরে এই অঞ্চলের পরিবেশগত সম্পদকে মূলত কৃষি জমিকে তাদের জীবন-জীবিকার স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে এবং এই অঞ্চলে এই কৃষিনির্ভর অর্থনীতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও উন্নত জায়গায় অবস্থান করছিল (সিঙ্গুর কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, ২০০৫)। যার ওপর আকস্মিক সরকারের শিল্প-কারখানা গড়ার ঘোষণা, এই অঞ্চলের অর্থনীতির ধারা ও গতিপথের পরিবর্তন করে দেয়। সিঙ্গুর এলাকায় কৃষি পরিবেশ (Agro Ecology) সম্পর্কে বিশদ না জেনে,গুরুত্ব না দিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা,উপনিবেশিক আইন এর সাহায্য জমি অধিগ্রহণ করেছে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার (Fernandes, 2012)। সিঙ্গুরের কৃষি ইতিহাসকে (Agrarian History) তুলে ধরলে ঐ অঞ্চলের কৃষি সমৃদ্ধি চিত্র আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে (মুখোপাধ্যায়, ১৯৯১)। সিঙ্গুর ব্লকে মোট কৃষিজমি ১০,৫২৬ হেক্টর, সেচসেবিত ৮৮৩০ হেক্টর, যা মোট কৃষি জমির ৮৩ শতাংশ। সিঙ্গুরে শস্য নিবিড়তা ২২০ শতাংশ, যা উর্বর হুগলী জেলার শস্য নিবিড়তা থেকে ৫ শতাংশ (সিঙ্গুর কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, ২০০৫)। টাটার শিল্প কারখানার জন্য অধিগৃহীত জমিতে ২৭ টি অগভীর

[1] ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন একটি কেন্দ্রিয় আইন, যা একশো বছরেরও বেশি প্রাচীন এবং উপনিবেশিক শাষকেরা তার দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থরক্ষায় কথা মাথায় রেখে প্রণয়ন করেছিল। সেই আইন মেনে বর্তমানে স্বাধীন ভারতের শাষকেরা জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করে চলেছে।এই আইনের প্রয়োগে দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।জনস্বার্থে জমির প্রয়োজন এবং কোম্পানীর জন্য জমির প্রয়োজন। অধিগ্রহণের পদ্ধতি দুটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক।আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধারা অনুযায়ী জনস্বার্থে এবং সপ্তম অধ্যায় অনুসারে কোম্পানীর জন্য অধিগ্রহণ করাটাই নিয়ম, জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণের জন্য কোন কেন্দ্রিয় বিধি (Rule) না থাকলেও কম্পানির ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় Land Acquisitions (Companies) Rules, 1963 অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। পশ্চিমবঙ্গে জনস্বার্থে অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য রাজ্য Land Acquisition Marital 1991 কে বর্তমান বিধি হিসাবে মান্য করা হয়। এখন যে অধিগ্রহণ আইন দৃষ্টিগোচর হয় তা মুলত ১৯৮৪ সালের সংশোধিত রূপ।

নলকূপ এবং তিনটি গভীর নলকূপ ছিল,যা এই অঞ্চলে চাষিরা বেশিরভাগই নিজেদের খরচে এগুলি বসিয়েছিল, এছাড়া জলসেচ কুন্তি, জুলকিয়া, ডিভিসি জল থেকে হয়ে যেতো (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,২০১৬)। রাজ্যের অন্যতম উর্বর ব্লক সিঙ্গুরের এই অঞ্চল রাজ্যর মধ্য অন্যতম কৃষি উৎপাদক অঞ্চল। দামোদর ও গঙ্গার মধ্যবর্তী এই অঞ্চল পলি মাটিতে সমৃদ্ধ হওয়ায় কারণে এই অঞ্চলে চাষ যোগ্যতা অনেক বাড়িয়েছে (সরকার, ১৯৯৬)। তারকেশ্বর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ও অত্যধিক আলুর চাষ এই অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি কে মজবুত করেছে, অন্যদিকে এই অঞ্চলটি অবস্থানগত সুবিধা,একাধিক রেলপথ ও সড়কপথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শেওড়াফুলি ও শিবাইচন্ডী সবজির বড় হাট, স্থানীয় রতনপুরে বড় আলু বাজার,এই অঞ্চলে ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশ কৃষির উন্নতি ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণকে ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছে। এছাড়া যে কৃষি-পরিবেশগত সম্পদ সিঙ্গুরের কৃষকেরা পেয়েছিল,তার যৌক্তিক ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। এই অঞ্চলের নিকটবর্তী গঙ্গা নদীর ধারে পাটকল গুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হওয়ার কারণে,এখানে পাট চাষ এর বদলে স্থানীয় শেওড়াফুলি ও শিবাইচন্ডী হাটে সবজির চাহিদা অত্যন্ত বেশি থাকায় জন্য লাভজনক সবজি চাষ করতে থাকে আবার অপরদিকে রতনপুর আলু বাজারে থেকে বানিজ্যিকভাবে আলু রপ্তানি হওয়ার কারণে,অর্থকরী আলু চাষ এই অঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।পলি গঠিত এই অঞ্চলে পরিবেশ এর কারণে সবজি ও আলু চাষ খুব ভাল হওয়ায় কৃষি-অর্থনীতির সচ্ছলতা এই অঞ্চলে সামাজিক গঠন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (সিঙ্গুর কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, ২০০৫)।

এক

সিঙ্গুরে অধিগৃহীত জমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫,০০০ হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা যুক্ত ছিল(তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,২০১৬), শুধু তাই নয় সিঙ্গুরের বাইরের অঞ্চল থেকেও বছরের কয়েক মাস এই অঞ্চলে কৃষি শ্রমিকরা আসতেন। জমি অধিগ্রহণের ফলে এই জমির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল বিশাল সংখ্যক সাধারণ কৃষক, বর্গাদার, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুরদের জীবন-জীবিকা, পরিবেশ থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয় (Nielsen, 2018)। কিন্তু সিঙ্গুরের ইতিহাস জমি আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যর এক গৌরবজনক ধারাকে বহন করে। সিঙ্গুর সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের অতীত সংগ্রাম-আন্দোলনের ইতিহাস থেকে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হল, সিঙ্গুরের কৃষক নিজেদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে, নিজেদের দাবি আদায়ে বরাবরই দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে ও সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন করছে (সারা ভারত কৃষক সভা,হুগলী জেলা কমিটি, ১৯৯৭)। প্রাক্-স্বাধীনতা সময়ে বা স্বাধীনোত্তর সময়ে বা অতি সম্প্রতি জমি অধিগ্রহণ বিরোধী সিঙ্গুরে কৃষক আন্দোলন,যে যেকোনো আন্দোলনকে ধরি না কেন, আন্দোলন মূলত সংগঠিত করেছিল ছোট ও মাঝারি কৃষক, ভাগচাষী-বর্গাদার কৃষক এবং ক্ষেতমজুররা। কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দেখা গেছে যে, যেখানেই জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছে, সেখানেই ভূমিহীন কৃষক বা বর্গাদার-ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত রূপ অধিক আকারে দেখা গেছে এবং তাদের দাবিগুলির ওপর দাঁড়িয়ে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে (দাস, ১৯৯৬)। বস্তুতঃ বামফ্রন্ট সরকার এই শ্রেণীর মানুষজনের ব্যাপক সমর্থন নিয়েই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল।ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্টের নীতির ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর মানুষদের দাবিগুলো স্বাভাবিকভাবেই অধিক মান্যতা পেয়েছে এবং এই শ্রেণীর মানুষজনের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে। তেভাগা আন্দোলনে বড়া কমলাপুর, ডুবিরভেড়ি কৃষক ও কৃষক রমণীদের আন্দোলন ও শহীদে মৃত্যুবরণ ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে (রসুল, ১৯৯০)। পরিবেশতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মূলধারার ইতিহাসবিদরা পরিবেশকে শুধু পটভূমি হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে টাটার ছোট গাড়ি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে যে সামাজিক-পরিবেশগত পরিবর্তন, এই অঞ্চলে সমাজ তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে কিভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, বস্তুত: যে আন্দোলন ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তন ঘটেছিল,সেই জমি আন্দোলনকে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তুলে ধরব।

"কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ"- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিভিত্তি রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল,২০০৬ সালে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর। শিল্প-কলকারখানা গড়ার প্রক্রিয়া হিসাবে কৃষিজমি নেওয়া ব্যাপক হারে শুরু হয়, পরিবেশ গত প্রভাব এর কথা মাথায় না নিয়েই।কিন্তু কৃষিজমি হল এমন এক পরিবেশগত সম্পদ (Ecological Resources)যা কৃষক তথা কৃষক পরিবারের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা প্রদান করার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সুস্থায়ী উন্নয়নকে (Sustainable Development) সংরক্ষিত করে এবং এর পাশাপাশি অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে কৃষিজমি তথা কৃষিকার্যের গুরুত্ব খাদ্য ও পুষ্টি এবং জীবন-জীবিকা তথা কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আছে (Batabyal, 2015)। উপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে বিশ্বায়িত উদার অর্থনীতিতে রূপান্তর সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর (Nielsen,2018)। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে; বিশ্বায়িত উদার অর্থনীতিতে ভারত সহ সমস্ত কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন বলতে মূলত যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো কিছু জমি থেকে কৃষকের উচ্ছেদ বা শিল্প স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ।বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special economic zone, 2018), শিল্পাঞ্চল, নগরায়ন এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মের নামে রাষ্ট্র নির্বিচারে কৃষকের জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রায়শই রাষ্ট্রের আইন ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতের বেশিভাগ সরকার "Eminent Domain" তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ করে এসেছে (Fernandes,2012)। উন্নয়ন তথা শিল্পের জন্য জমির মালিকদের অন্যত্র বাসস্থান দেওয়া,নতুন জীবিকা পুনঃর্বাসিত করা, ক্ষেত মজুর বা বর্গাদার দের জীবন-জীবিকা আশ্রয়ের বিকল্প সংস্থান করা,পরিবেশ গত প্রভাব গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিবেচনা করা-এই ধারণাগুলি তেমন স্বীকৃতি বা প্রাসঙ্গিকতা পায়নি।২০০৬ সালে নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এলে,শিল্পায়নের পথে দ্রুত আর্থিক অগ্রগতির ওপর যে জোর তাদের নীতিতে পড়েছিল, তা রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং পরিবেশ সংকান্ত নীতির কিছু মৌলিক শর্তকে লঙ্ঘন করে। বস্তুতঃ: তাঁদের এই গৃহীত নীতিই দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জনসমর্থনের ভিত্তিটাকে পুরোপুরি নড়বড়ে করে দিয়েছিল। ২০০৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের পর বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন ও শিল্পায়ন সম্পর্কিত নীতি বিশেষ করে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে শিল্প স্থাপন, নগরায়ন ও 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' স্থাপনের কর্মসূচি অতি তৎপরতা সাথে শুরু হয়। ২০০৬ সালে মাঝামাঝি হুগলী জেলার বর্ধিষ্ণু কৃষি অঞ্চল সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের গাড়ি কারখানা স্থাপনের জন্য এবং ২০০৭ সালে পূর্ব মেদিনীপুরে নন্দীগ্রামে ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীকে রাসায়নিক শিল্প কারখানার জন্য 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' এর নামে কৃষিজমি অধিগ্রহণ ও প্রস্তাবে বিপক্ষে বিক্ষোভ-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বামফ্রন্ট সরকারের জনভিত্তি ও কর্মসূচী দিকে তাকালে যেখানে ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ভূমি সংস্কারের ওপর জোর দিয়ে ছিল এবং নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। বস্তুতঃ ২০০২ সালে বামফন্ট সরকারের ঘোষিত কৃষি নীতিতেও এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে বর্তমান কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ভূমি সংস্কারের যতটুকু কাজ বাকি আছে তা সম্পন্ন করা হবে ("বামফন্ট সরকারের কৃষিনীতি",২০০২)। ভূমিসংস্কারের ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিবিড় চাষ ও উদ্যোগ এবং ক্ষুব্ধ জমির মালিকদের উন্নত বীজ সার এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছিল ।কৃষি ক্ষেত্রে এই উন্নতির ফলস্বরূপ গ্রামাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পরিবারগুলি হাতে কিছু অতিরিক্ত সঞ্চয় এসেছিল। গ্রাম ও আধা শহরগুলিতে এই সঞ্চয় অর্থের ওপর ভিত্তি করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল ক্ষুদ্র শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার ফলে নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল, ক্ষুদ্র শিল্পের তৈরি করা পণ্যের চাহিদা কিছুটা গ্রামাঞ্চলে এবং বাকিটা বাজার শহরাঞ্চলে মিটে যেত, ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র সংস্থার গুরুত্ব খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল (সেন, ১৯৮৮)। কিন্তু ১৯৯০ এর দশকে মূলত বিশ্বায়ন ও নয়া উদার আর্থিক নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে নানা ধরনের বাজারমুখী পরিবর্তন ঘটেছে, আবার এই সময়কালে ভূমি সংস্কারের গতি ও প্রক্রিয়া ক্রমশ শ্লথ হয়ে

পড়েছিল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বামফ্রন্টের যত নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ততই ভূমি সংস্কারের পরবর্তী আবশ্যিক পদক্ষেপগুলি কে উপেক্ষা করা হয়েছে। ১৯৬০-৭০ দশকে যে সামাজিক আন্দোলনের ফলে উৎসাহিত গণচেতনা ও গণ উদ্যোগের ফলস্বরূপ পাট্টা দেবার ও বর্গা অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলছিল, তা কার্যত এই সময়কালে উল্টো পথে যেতে শুরু করে।

সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা পাবার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন রাজ্যের শিল্পায়নই হবে তার সরকারের উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচির প্রথম ও প্রধান বিষয় (আজকাল, ২০০৭)।যার প্রক্রিয়া হিসাবে সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি থেকে পুঁজি আনার প্রতিযোগিতায় নামে অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে,কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিটি নির্বাচনী ইশতেহারে ভূমি সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা, তার ভিত্তিতে শ্রম নিবিড় ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর জোর দেওয়া, সমবায় ব্যবস্থাকে উন্নত ভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবে কর্মসংস্থান বাড়ানোর প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছিল অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিকল্প এক অর্থনৈতিক কর্মসূচির ওপর প্রতিনিয়ত জোর দেওয়া হয়েছিল। এমনকি ২০০১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে নির্বাচনে জিতেও শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেছিলেন, বিকল্পে ধারণা নিয়ে বারবার জনগণের কাছে যেতে হবে, এক ফসলী জমিকে দু-ফসলী করার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষিতে সংঘটিত অগ্রগতির ওপর নির্ভর করে শিল্পের কথা ভাবতে হবে, চীন যেমন মাও সময়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বেশি কর্মসংস্থানের পথ অনুসরণ করেছিল, সেই রকম করতে হবে (সেন, ২০০২)। অথচ সেই নিরুপম সেন 2008 সালে সপ্তম বামফ্রন্ট গঠনের পরে একটি তত্ত্ব হাজির করলেন তার মতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি কাজ করে কোনও লাভ নেই বরং জমি বিক্রি করে সেই টাকা ব্যাংকে রাখলে সুদ বাবদ অনেক বেশি টাকা উপার্জন করা যাবে ("মুখোমুখি শিল্পমন্ত্রী", ২০০৮)।

দুই

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে সকলের কাছে সিঙ্গুরের নাম নতুন করে শোনা, হুগলী জেলার বর্ধিষ্ণু কৃষিজীবী এলাকা সিঙ্গুর ব্লকে পাঁচটি মৌজার যথাক্রমে গোপালনগর, বেড়াবেড়ী, খাসেরভেড়ী, সিংহেরভেড়ী, বাজেমেলিয়া জমিতে টাটার গাড়ি এবং এবং অনুসারী শিল্পের জন্য জমি চিহ্নিত ও কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। এই মৌজা গুলির উত্তর-পূর্বদিকে বৃত্তাকার এ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, দক্ষিণে শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রেলপথ, পশ্চিমে হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইন এর কামারকুন্ডু থেকে চন্দনপুর রেলস্টেশন। এইরকম রেলপথ থাকার ফলে এই ব্লকে সর্বমোট পাঁচটি রেল স্টেশনের অবস্থান।

একনজরে সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ (Status Report on Singur, 2007)		
মৌজার নাম	মৌজার মোট জমি(একর)	মৌজার অধিকৃত জমি (একর)
গোপালনগর	১৬৫৬.৫৫	৩৯৯.৯৮
বেরাবেড়ী	১০৪৩.৮২	৩২৭.২১
খাসেরভেড়ী	২২৯.৬২	১৮০.৫৯
সিংহেরভেড়ী	৩৫৫.১৩	৪৭.৭৭
বাজেমেলিয়া	৩১০.৭৫	৪১.৫৬
মোট	**৩৫৯৫.৮৭একর**	**৯৯৭.১১ একর**

টাটা'র প্রকল্প ("একনজরে সিঙ্গুর প্রকল্প" , ২০০৯)	
মূল কারখানা	৬৪৫.৬৭ একর
বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪.৩৩ একর
WBIDCL	৪৭.১১ একর
টাটার ৯৬ টি ইউনিটকে	২৮৪ একর
জলাধার	০২ একর
অন্যান্য	০৪ একর

ওপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া টাটা প্রকল্প সংক্রান্ত স্ট্যাটাস রিপোর্ট অনুযায়ী, টাটা প্রকল্পের জন্য সর্বমোট যে ৯৯৭.১১ একর জমি নেওয়া হয়েছিল তারমধ্য টাটা মূল কারখানা ৬৪৫.৬৭ একর জমিতে হওয়ার কথা ছিল, বাকি জমিতে নানা অনুসারী শিল্প এবং আলাদা করে ৯৬ টি টাটার ইউনিট গঠনের প্রস্তাব ছিল। এছাড়া জলাধার নির্মাণ,ভেন্ডার পার্ক, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের হাতে কিছু পরিমাণ জমি ছিল("একনজরে সিঙ্গুর প্রকল্প",২০০৯)। সিঙ্গুরে কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা ছিল মূলত ছোট চাষী, নথিভুক্ত ও অনথিভূক্ত ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর পরিবারগুলি থেকে যাদের সংখ্যাটা ছিল বেশ ভালো।জমির সঙ্গে এই ছোট চাষী, নথিভুক্ত ও অনথিভূক্ত ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর পরিবারগুলি পরিবেশগত ও সংস্কৃতির যোগের কথা সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে উঠে এসেছে সেই যোগটাও ভিন্ন ভিন্ন মানুষজনের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান ও আর্থিক অবস্থা থেকে আলাদা নয়। মূলত জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক বিভাজনটা আর্থিক সামাজিক সক্ষমতা বিচারে দুই শ্রেণীর প্রতিফলন ।বামফ্রন্ট সরকার সক্ষমতা কেন্দ্রিক এই আর্থিক ও সামাজিক পার্থক্য দূর করার লক্ষ্য স্থির না থেকে অর্থনৈতিক প্রগতির যে পথ বেছে নিয়েছিল তা দুর্বলদের থেকে সম্পন্নদের লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশী ছিল।দুর্বলদের প্রতি এই অবহেলা একটা অর্থনৈতিক বিষয়ে মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রশ্নটাকে সামনে আনে। অনিচ্ছুক ছোট চাষী ও ভাগচাষীরা কোন আশঙ্কা থেকে জমি দিতে রাজি ছিল না এবং আগ্রহীরা জমির পরিবর্তে আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিতে রাজি হওয়ার পিছনে কোন সম্ভাবনা বা প্রণোদনা কাজ করছিল সরকার এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেনি।

তিন

সিঙ্গুরে জমি অধিকৃত এলাকায় বিশাল সংখ্যক ভাগচাষী ও খেতমজুর পরিবারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যারা মূলত জমির ওপর নির্ভরশীল ছিল বিকল্প পেশায় সেই ভাবে যুক্ত ছিল না তাদের কাছে জমির গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। একই সাথে এমন অনেক পরিবার ছিল যারা কৃষিকার্যে ক্ষেতমজুর নিয়োগ না করেই নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত থাকত, তাদের কাছে কৃষিজমির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক (Nielsen, 2018)। বিরোধিতাটা এসেছিল মূলত এদের থেকেই অপরদিকে সিঙ্গুরে এক শ্রেণী কৃষক দের লক্ষ্য করা যায় যারা পেশাগত কারণে কৃষিক্ষেত্র থেকে সরে গেছে, যাদের সাথে কৃষি জমি সেই অর্থে কোনো যোগ নেই,খাতায়-কলমে শুধুমাত্র সরকারি নথিতে মালিক হিসেবে রয়ে গেছে, এরা মূলত সিঙ্গুর প্রকল্পে উৎসাহিত হয়ে জমি দিয়েছিল (Batabyal, 2015)। কেন দিয়েছিল? কারণ তার কাছে কৃষিজমি গুরুত্ব খুব বেশি ছিল না,কারণ সে ইতিমধ্যেই ওই জমি থেকে সরে এসে অন্য পেশায় সরে গেছে, সে কৃষি জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের একটা ভাগ পেত শুধু,সেটাও অধিকাংশ সময় দিত না বর্গাদাররা, তাদের কাছে প্রকল্পে জমি দেওয়াটা একটা সুযোগ তৈরি করেছিল সুতরাং জমির মূল্যটা একটা নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ অংকে বেঁধে দিলে হয় না, যেটা দেখার বিষয় তা হল জমির ওপর নির্ভরশীলতা, কৃষি অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ততা, আর্থিক সামাজিক পরিবেশের সাথে জীবন-জীবিকার বিষয়টি।এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিঙ্গুরের অভিজ্ঞতা সেই বিষয়টাকেই তুলে ধরে।

একটা সাধারণ ধারণা আছে জমি থেকে যা রোজগার হয়, তা ক্ষতিপূরণ করে দিতে পারলেই জমির মূল্য দেওয়া হয়ে যায় কিন্তু আমার গবেষণায় যে বিষয়টা লক্ষ্য করছি তা হল, জমি শুধুমাত্র রোজগার বা জীবিকার সম্বল নয়,

সিঙ্গুর প্রকল্পের কথা যদি ধরা হয় যে পরিমাণ কর্মচ্যুত হয়েছিল সেই পরিমাণ যদি কর্মসংস্থান হত যদিও সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ কম কিন্তু সিঙ্গুরে শিল্প শহর তৈরি হলে প্রথার বাইরে নানা কাজে রোজ গার বেশি হতে পারতো কিন্তু মূল বিষয়টা হলো একজন কৃষক সে কখনোও অটো ড্রাইভার হতে চায় না,সে কৃষি-অর্থনৈতিক পরিবেশে জীবন কাটিয়েছে,সেই পরিবেশে নিজেকে সে খুব নিরাপদ মনে করে,তা সে হারাতে চায় না, এবং তার কাছে জীবিকার যে রূপান্তর, তা খুব যন্ত্রণাদায়ক। সিঙ্গুরে সাধারণ কৃষক, বর্গাদার, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুরা তাই প্রতিবাদ করেছিল যার ফলস্বরুপ সিঙ্গুরে জমি আন্দোলন।

চার

সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সংক্রান্ত যে তথ্যটি সামনে এসেছে,সেখানে উন্নয়নের পাশাপাশি উচ্ছেদটাও হবে। শিল্প কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় উচ্ছেদের কারনে মানুষের দুর্দশা কিরূপ হয়েছে। তিনি তাঁর বইতে তুলে ধরেছেন ১৯৪৭ থেকে ২০০০ সালের মধ্য উন্নয়নের অভিঘাতে সারা ভারতবর্ষে ৫ কোটি মানুষ জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা তার মধ্য দিয়ে বাস্তুচ্যুত,উচ্ছেদ ও জীবিকা চ্যুত হয়েছেন। এবং তিনি এও দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৭৫ লক্ষ মানুষ জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে জাতীয় ক্ষেত্রে ৬৬ শতাংশ মানুষের ভাগ্যে কোন প্রকার পুনর্বাসন হয়নি,পশ্চিমবঙ্গে ৯১ শতাংশ পুনর্বাসন সুযোগ পায়নি (Fernandes, 2012)। সুতরাং জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এককালীন অর্থের বিনিময়ে ক্ষতি পূরণ করার যে নীতি তা গ্রহণযোগ্য নয় কৃষকের জমি অধিগ্রহণের ফলে সে যে জীবন-জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরবর্তীতে অধিগ্রহনের এর কারণে তার ওপর ধারাবাহিকভাবে অর্থনীতির যে আঘাত এসে পড়বে তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক কে পরিকাঠামো দিতে হবে,ক্ষতি পূরণের ক্ষেত্রে জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে কৃষকের পরিবেশটাকে পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রতিবেশী, সামাজিক অবস্থান ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র অর্থনীতির লাভ-ক্ষতির দিয়ে বিষয়টিকে ধরা যাবে না। সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব লক্ষ্য করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে সিঙ্গুরে স্থানীয় বাস্তুগত অর্থনীতি যার মধ্যে সম্পৃক্ত আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয় জড়িয়ে আছে জমি অধিগ্রহণের ফলে তা ভেঙে পড়েছে সুতরাং উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তুতন্ত্র তথা পরিবেশের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া খুব জরুরী। একই সাথে জরুরি এক সুস্থির কাঠামোর মধ্য সমাজ,পরিবেশ ও অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। সুতরাং সিঙ্গুরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের মতো কৃষি প্রধান দেশে কৃষি ও শিল্প ঘিরে ভিত্তি-ভবিষ্যতের দ্বন্দ্বে জোর দিতে হবে শ্রম নিবিড় কৃষি-কেন্দ্রিক শিল্প স্থাপনের ওপর এবং তা হতে পারে সমবায় ব্যবস্থায়, কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে। সুস্থায়ী উন্নয়নের পথে, পরিবেশ ভাবনা কে সঙ্গে নিয়েই।

সূত্রনির্দেশ:

১. জোয়ারদার,মানস(২০০৯).উন্নয়নের কিছু কথা, কলকাতা:নাগরিক মঞ্চ ,কলকাতা.
২. সিঙ্গুর কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক(২০০৫). কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী সহয়িকা,সিঙ্গুর: সিঙ্গুর ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, সিঙ্গুর.
৩. Fernandes, W. (2012). Progress: at Whose cost?: Development-Induced Displacement in West Bengal,1947-2000,Gauhati:North Eastern Social Research Centre,Gauhati.
৪. মুখোপাধ্যায়, সু. কু. (১৯৯১). বাংলার আর্থিক ইতিহাস, কলকাতা: কে. পি. বাগচী, কলকাতা.

৫. তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ (২০১৬). সিঙ্গুর—ঐতিহাসিক আন্দোলন, ঐতিহাসিক রায়, কলকাতা: তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা.

৬ সরকার, গৌ (১৯৯৬). ভারতে কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা.

৭. Nielsen, K.B. (2018). Land Dispossession and Everyday Politics in Rural Eastern India, London: Anthem Press, London.

৮.সারা ভারত কৃষক সভা, হুগলী জেলা কমিটি (১৯৯৭). কৃষক সভার ৬০ বৎসর, শ্রীরামপুর, হুগলি: সারা ভারত কৃষক সভা, হুগলী জেলা কমিটি, শ্রীরামপুর.

৯. দাস, সু (১৯৯৬). বাংলার তেভাগা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত: কিছু অনুসন্ধান ও বিতর্ক: কলকাতা: পরিচয়, কলকাতা.

১০. রসুল, আ. মো (১৯৯০). কৃষকসভার ইতিহাস, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা.

১১. Batabyal, S (2015). Environment, Politics and Activism: The Role of Media, New Delhi: Routledge, New Delhi.

১২. বামফন্ট সরকারের কৃষিনীতি (২০০২, ১২ই জুন). দৈনিক গনশক্তি , কলকাতা, পৃষ্ঠা -৪.

১৩. সেন,অ (১৯৮৮).পদাতিকের কথা, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,কলকাতা.

১৪. মুখোমুখি শিল্পমন্ত্রী(২০০৮, ৭ অক্টোবর). আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১.

১৫. Govt. of West Bengal (2007).Status Report on Singur: Information for the public. Retrieved from https://www.wb.gov.in/portal/documents/10180/0/Status+Report+on+ Singur/25c3412f-997b-4fb7-8e52-a6faa5404647?version=1.0

১৬. একনজরে সিঙ্গুর প্রকল্প(২০০৯,৯সেপ্টেম্বর).আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা,পৃষ্ঠা-১.

১৮. আজকাল(২০০৭).নন্দীগ্রাম: কলকাতা, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা.

১৯. Special Economic Zone.2018) Retrieved July 8, 2018, from Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special_economic_zone?wprov=sfla1

২০. Eminent Domain: "Eminent domain means the power of the sovereign to take property for public use without the owner's consent".